একটি বই একটি কলাম ও কিছু মন্তব্য

আবদুল মান্নান

লেখাটি শুরু করি একটি বইয়ের কথা দিয়ে। আলী রিয়াজের বই, যুক্তরাষ্ট্রের রোমেন এ্যান্ড লিট্‌লফিল্ড প্রকাশ করেছে, ২০০৪ সালে। God willing : The Politics of Islamism in Bangladesh (গড উইলিং : দি পলিটিক্স অব ইসলামিজম ইন বাংলাদেশ)। বইটিতে আলী রিয়াজ চেষ্টা করেছেন ব্যাখ্যা করতে একটি রক্তস্নাত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল সে দেশটি কিভাবে তিন দশকের মাথায় একটি গোঁড়া মৌলবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

ড. আলী রিয়াজ এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর বিবিসির বাংলা বিভাগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সময় গোলাপী দলের একজন সমর্থক ছিলেন বলে জানা যায়। আলী রিয়াজের গ্রন্থের কোন সমালোচনা লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। সেটা হয়ত আরও যোগ্য কোন ব্যক্তি করবেন। বর্তমান সরকার যখন তার মেয়াদকালের তিন বছর পূর্তি করেছে তখন তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 'Persecuted Minorites and the 'Enemy Within' নিয়ে সামান্য আলোচনা অপ্রয়োজনীয় হবে বলে মনে হয় না।

পাঁচ বছর পূর্ণ মেয়াদ ক্ষমতায় থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০১-এর পনেরোই জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করল। এই শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের পর প্রথম যে অশান্ত কর্মটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেই শুরু হলো তা হচ্ছে প্রশাসনের ছত্রছায়ায় সংখ্যালঘু নির্যাতন। আলী রিয়াজ এই সময়ে বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর পরিচালিত নির্যাতনের কাহিনী, সম্পাদকীয়, মন্তব্য ইত্যাদি সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। এই সময়ে বিশেষ করে সংখ্যালঘু ও মহিলা ভোটারদের ওপর চরম চাপ সৃষ্টি করা হয়, তাঁরা নির্বাচনের দিন যেন ভোট দিতে না যান। সংখ্যালঘুদের সব সময় এদেশে আওয়ামী লীগের সমর্থক হিসাবে গণ্য করা হয়। চাপ সৃষ্টিকারীরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সফল হয়েছিল। এই নির্বাচনে শুধু যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় জোট সন্ত্রাসের শিকার হয়েছিল তা নয়, সারাদেশে আওয়ামী লীগ সমর্থক, নেতাকর্মী সকলের ওপরই নির্বাচনের পূর্বে ও পরে নরক ভেঙ্গে পড়েছিল।

আলী রিয়াজ নির্বাচনপরবর্তীকালে সংঘটিত সন্ত্রাস ও নির্যাতনের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার প্রকাশিত প্রতিবেদনের উল্লেখ করেছেন। জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী, যিনি বর্তমান জোট সরকারের একজন ক্ষমতাধর মন্ত্রী, তাঁর নির্বাচনী এলাকার পাগলা হালদারপাড়ায় কুড়িটি নিম্নবিত্ত হিন্দু পরিবারের বাস। নির্বাচনে নিজামীর বিজয়ের পর তাঁর সমর্থকরা ঐ এলাকার হিন্দুদের গোমাংস খেতে বাধ্য করে। এর চাইতে মানবাধিকারের চরম অবমাননা আর কী হতে পারে!

খুলনা কালিকাবাড়ীর জামায়াতকর্মীরা ওই এলাকার সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর ওপর জিজিয়া কর ধার্য করে। তারা এই বলে হুমকি দেয় যে, কোন পরিবারের পক্ষে এই কর দেয়া সম্ভব না হলে তাদের পরিবারের অল্পবয়সী মেয়েদের তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। এই হুমকির পর অল্পবয়সী মেয়েরা এলাকা ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নেয়।

যে ক'টি জেলায় নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস, লুটতরাজ ও গণধর্ষণ নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করে তার মধ্যে ভোলা অন্যতম। ২ অক্টোবর জোট সমর্থকরা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত একটি গ্রাম আক্রমণ করে। লক্ষ্মী ও তার পুত্রবধূ তস্করদের হাতে ধৃত হয়। সাতজন মিলে এই দু'জনকে পালা করে ধর্ষণ করে। লক্ষ্মী বার বার চিৎকার করে ধর্ষকদের কাছে কাকুতি করে, তার পুত্রবধূ চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা। কিন্তু এই নরপশুদের কাছে এই কাকুতি ছিল অর্থহীন। ১ অক্টোবর বিবাহিত ছায়ারানীকে গণধর্ষণ করা হয় পাশের গ্রামে। পরদিন ছায়ারানী তার নিজ বাড়িতে ফিরে আসে। ধারণা ছিল, ভয়ঙ্কর রাতটি বোধহয় শেষ হয়েছে। বেলা দশটার সময় তার ভুল ভাঙল। হায়েনারা আবার ফিরে আসে। আতঙ্কে ছায়ারানী পুকুরে ঝাঁপ দিলে পাষণ্ডরা ছায়ারানীর দশ বছর বয়সী বাচ্চাকে তুলে নিয়ে তাকে পুকুরে ছুড়ে ফেলতে উদ্যত হলে ছায়ারানী তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সারাদেশে নির্বাচনপরবর্তীকালে জোট সমর্থক নেতাকর্মীরা সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন করেই ক্ষান্ত হয়নি, অনেক জায়গায় তাদের উদ্দেশ করে বলে, বাংলাদেশ তাদের দেশ নয়। তাদের উচিত অতি সত্বর ভারতে চলে যাওয়া। এ সবই হচ্ছিল পবিত্র ইসলাম ধর্মের নামে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়।

১৯৭৪-এর জনসংখ্যা জরিপে বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ছিল ৯.৬ মিলিয়ন। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে এই সংখ্যা বর্তমানে ১৩.০৫ মিলিয়ন হওয়ার কথা। বাস্তবে সরকারী হিসাব মতে তা ১১.৩২ মিলিয়ন। অর্থাৎ এক বিপুলসংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী বাংলাদেশ থেকে 'অদৃশ্য' হয়ে গেছে। আলী রিয়াজ মনে করেন, বর্তমান ভূরাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জনগণ ও সিভিল সমাজকে নির্ধারণ করতে হবে তাঁরা কী ধরনের আগামী দিনের বাংলাদেশ প্রত্যাশা করেন। বর্তমানে বাংলাদেশের ধর্মপ্রিয় ইসলাম লেবাসধারী রাজনৈতিক দলগুলো হয়ত বিচ্ছিন্নভাবে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। কিন্তু আগামীতে এদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বহুজাতিক সন্ত্রাসী দলগুলোর যে যোগাযোগ ঘটবে না তা বলা যায় না। বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বর্তমানে এক চরম বিপর্যয়ের মুখে। জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছিল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের কথা বলে। তা এখন সোনার হরিণ।

গত ১১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের ডন পত্রিকায় ভারতের প্রখ্যাত কলামিস্ট কুলদ্বীপ নায়ারের প্রকাশিত একটি কলাম নিয়ে বাংলাদেশে বেশ শোরগোল হচ্ছে। ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ হত্যাকাণ্ড ও শেখ হাসিনাকে হত্যাচেষ্টার পর বাংলাদেশে এসেছিলেন নায়ার। এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন। ফিরে গিয়ে তিনি 'Blame game in Bangladesh' নামে ডন পত্রিকায় এই কলামটি লেখেন। এই কলামটি দেশের একটি জাতীয় বাংলা দৈনিক ও একটি ইংরেজী দৈনিকে পুনর্মুদ্রিত হয়। সরকারী বার্তা সংস্থা বাসসও এই কলামকে পুঁজি করে তাঁর বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে এই মর্মে একটি সংবাদ পরিবেশন করে যে, ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার জন্য শেখ হাসিনা সেনাবাহিনীকে দায়ী করেছেন। নায়ারের মূল লেখায় এটি ছিল তাঁর ধারণাভিত্তিক একটি নিজস্ব মন্তব্য– যেখানে তারেক জিয়া, পাকিস্তানের ভূমিকা এবং বিএনপি-জামায়াতের ষড়যন্ত্রের কথাও আছে। নায়ারের মন্তব্যগুলো ছিল শেখ হাসিনা ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ওপর ভিত্তি করে, তার মনে হওয়ার কথা। কুলদ্বীপ নায়ার মনে অনেক কিছুই করতে পারেন। তাঁর মনের ওপর কারও হাত নেই। এই মনে করার বিষয়টিকে পুঁজি করে জোট সরকার সেনাবাহিনীকে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের মুখোমুখি করতে চেয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সেনাবাহিনী সেই ফাঁদে পা দিয়েছে।

গত ২২ আগস্ট আইএসপিআর এক বক্তব্য প্রকাশ করেছে কুলদ্বীপ নায়ারের কলামের ওপর ভিত্তি করে। প্রকাশিত সংবাদ খোদ কলামটিতে করা মন্তব্য উল্লেখপূর্বক বলেছে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার সঙ্গে সেনাবাহিনী কোনভাবেই জড়িত নয় এবং এ ধরনের সংবাদ বা মন্তব্য প্রকাশের ফলে সেনাবাহিনী অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। আইএসপিআরের বক্তব্যে সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমের কথা বেশ জোর দিয়েই বলা হয়। বক্তব্যে আরও বলা হয়েছে, "বিদেশী একজন সাংবাদিকের নিকট বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনার মতো একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব, যিনি বিগত সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন...দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী সম্পর্কে এরূপ দায়িত্বহীন মন্তব্য করেছেন তা বিশ্বাস করা কঠিন।" অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও সঠিক মন্তব্য।

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ফসল। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে দেশের আপামর জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা যেভাবে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছে তা এদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে স্বাধীন বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রথম সর্বাধিনায়ক জাতির জনক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান। এই সর্বাধিনায়ককেই সামরিক বাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্য ১৯৭৫-এর পনেরোই আগস্ট সপরিবারে হত্যা করেছে। এই সশস্ত্র বাহিনীর কিছু সদস্যের হাতে নিহত হয়েছেন আরেক রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক জেনারেল জিয়া। এর দায়দায়িত্ব নিশ্চয় সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যের ওপর বর্তাবে না। ১৯৯০-এর গণআন্দোলনের মুখে এরশাদের পতনের পূর্ব মুহূর্তে দেশে এক ঘোলাটে পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে অনেকের ধারণা ছিল, সেনাবাহিনী এর সুযোগ গ্রহণ করবে। সে আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী দেশের মানুষের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। ১৯৯৬-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও আর একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। সে পরিস্থিতিও বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখেছে। সুতরাং বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর দেশপ্রেম নিকট-অতীতে কখনও প্রশ্নবিদ্ধ হয়নি। আগামীতেও হবে না বলে দেশের মানুষ বিশ্বাস করে।

শেখ হাসিনা দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তাঁর দেশপ্রেম নিয়ে সন্দেহ করা মূর্খতার শামিল। তার ওপর তিনি এমন এক ব্যক্তির কন্যা, যাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এবং বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জন্ম হয়েছে। সেই শেখ হাসিনাকে ক্যান্টনমেন্টে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। যদিওবা গাড়ি থেকে নেমে দীর্ঘপথ হেঁটে সিএমএইচে তাঁর শিক্ষক, ড. হুমায়ুন আজাদকে দেখতে যান, তাঁকে দেখতে দেয়া হয় না। তিনি ঘাতকের হাতে নিহত বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার অন্যতম সাক্ষী কমোডর রব্বানীর ক্যান্টনমেন্টস্থ বাসভবনে গিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানানোর চেষ্টা করলে তাঁর সঙ্গে একই আচরণ করা হয়। ১৯৯৪ এ-বাংলাদেশ সামরিক একাডেমীর পাসিং আউট প্যারেডে বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসাবে তিনি অতিথি হয়ে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মধ্যাহ্নভোজের প্রাক্কালে সেই আমন্ত্রণ বাতিল করা হয়। এর চাইতে অসৌজন্যমূলক আচরণ কী হতে পারে!

প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী হওয়ার পর শেখ হাসিনা এসব বিষয় মনে রেখে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে কারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন বলে শোনা যায়নি। তাই অনেকের মনে তালগোল তখনই পাকায় যখন সরকারের কোন একটি অঙ্গ, সরকারের আজ্ঞাবহে পরিণত হয়।

একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে ...

ড. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

মৃত্যু–মৃত্যু–মৃত্যু। গ্রেনেড-বোমা হামলায় মৃত্যু, বন্দুকযুদ্ধে মৃত্যু, ছিনতাইকারীর হাতে মৃত্যু, ডাকাতের হাতে মৃত্যু, যৌতুকের দাবিতে হত্যা, কোন নিষ্পাপ যুবতী বা কিশোরীকে ধর্ষণ (গণধর্ষণ) করে হত্যা, তদুপরি আছে গাড়ী বা জাহাজ দুর্ঘটনায় মৃত্যু– কবির সোনার বাংলায় মৃত্যুর যেন এক মহোৎসব চলছে, যা আমরা প্রতিদিনই জাতীয় দৈনিক এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে দেখে থাকি। আর

স্মরণ করি একাত্তরের সেই রক্তচঞ্চল করা গানের কলি : একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি/ একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি/। ... এ সম্বন্ধে আমরা অতীতেও লিখেছি- প্রয়োজনে শতবার লিখবো।

সম্প্রতি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বিশেষ গুরুত্ব সহকারেই প্রচারিত চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানাধীন মইজ্জার টেকের সেই ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনার কথাই বলি। বরযাত্রী– বর-কনেসহ রিজার্ভ বাসটি প্রায় ৮০ জন যাত্রী নিয়ে আনন্দিত চিত্তে ফিরে যাচ্ছিল গৃহে, যাদের অধিকাংশই ছিল শিশু ও মহিলা। একটি কাঠ বোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোট ২৪ জন সঙ্গে সঙ্গে নিহত এবং বাকিরা মারাত্মকভাবে আহত হয়। হয়ত তাদের ভেতর আরও কয়েকজনের মৃত্যু হয়েও থাকতে পারে। বর-কনে বেঁচে আছে এ খবরও জানা যায় নি। ঝরে গেল কত ফুল!

পত্র-পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার রিপোর্টে দেখা যায়, উৎকোচ না দেয়ায় টহল পুলিশ ধাওয়া করলে বাসটি উর্ধগতিতে চালালে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। এতে কত সুখী পরিবার যে হারাল তাদের বৃদ্ধ মা, স্ত্রী, বোন বা শিশু (হয়ত কারও কারও একমাত্র শিশু)– সে চিত্রটি আমাদের হাতের কাছে নেই। একই রূপ ঘটনা ঘটেছিল মীর্জাপুর (টাঙ্গাইল)-এবং দিনাজপুরে।

শুধু চট্টগ্রামের এই ঘটনা নয় বাংলাদেশের সর্বত্রই এরূপ মর্মান্তিক, হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটছে, যা নিয়মিতভাবেই পত্রপত্রিকায়ও আসছে। এজন্য দায়ী ব্যক্তিদের কোথায় কি শাস্তি হয়েছে সে খবর আমাদের জানা নেই।

এই তো মাত্র ক'দিন পূর্বে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাবনাময়ী পিতৃহীন ছাত্রী সুমী ঘাতক গাড়ির চাকার নিচে শেষ হয়ে গেল। প্রত্যক্ষদর্শীগণ জানিয়েছেন, সুমী রাস্তার একদিকেই দাঁড়িয়েছিল– যাচ্ছিল ঢাকায় মায়ের কাছে। খবরে প্রকাশ, মেয়েটি গাড়ির নিচে পড়ে গেলে তার ওপর দিয়েই চালক গাড়িটি দ্রুত বেগে চালিয়ে দেয়। চালিয়ে না দিলে বলা যায় না মেয়েটি হয়ত শেষ পর্যন্ত বেঁচে যেতেও পারত, খালি হতো না মায়ের বুক। সে-ই হয়ত ছিল মায়ের একমাত্র ভবিষ্যত অবলম্বন। এমন ঘটনা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোপূর্বেও ঘটেছিল।

কিছুদিন পূর্বে দেখা গেল, একজন মহিলা সবুজ সঙ্কেত পড়ার পর রাস্তা পার হচ্ছিল– কিন্তু একটি গাড়ির পিছনের বাম্পারে তাঁর শাড়ির আঁচল জড়িয়ে যায়–কোলে ছিল শিশুসন্তান, হয়ত কাপড়ের আঁচল জড়িয়ে গেলে লাল সঙ্কেত জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে চালক গাড়ি চালিয়ে দেয়, বিষয়টি সম্পূর্ণ আঁচ করেই ইচ্ছাকৃতভাবে সে গাড়ি চালাতে থাকে। ছিনভিন্ন হয়ে যায় মহিলার দেহ। শিশুটিকে পথচারীরা কোলে তুলে নেয়। গাড়িটি পথচারীরা ধাওয়া করে লাল সঙ্কেতের কাছে ধরে ফেলে, চালক হয় প্রহৃত এবং গাড়িটি গণরোষে ভস্মীভূত। গায়ের জোর না দেখিয়ে একটু থামলেই তো এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত।

গত মাসে একই রূপ ঘটনা ঘটেছে পূর্বোক্ত মীর্জাপুরে (টাঙ্গাইল), এবং দিনাজপুরে এবং অনত্রও। প্রায়ই মুখোমুখি সংঘর্ষ বা ব্রেকফেল করে পাশের খাদে পতন, নির্দোষ লোকের প্রাণহানি। অন্যদিকে স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়গামী ছাত্রছাত্রীদের রাস্তা পারাপারের সময় বা সুমীর মতো রাইট সাইডে দাঁড়িয়ে থাকলেও তাদের ওপর দিয়ে উঠে দ্রুত চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে– রাস্তার পাশের কোন দোকানি বেচাকেনার কাজে ব্যস্ত, ব্রেক ফেল করে গাড়ি উঠে গেল দোকানে, মর্মান্তিক মৃত্যু হলো– কয়েকজন নির্দোষ লোকের, যারা হয়ত ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল অবলম্বন। পত্রিকার মতে, গত এক বছরে হাজারের ওপর গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

অন্যদিকে প্রায় প্রতিদিনই খবর হচ্ছে গাড়ি ডাকাতির, যাত্রীরা হন সর্বস্বহারা। প্রতিবাদ জানালে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হয় চলন্ত গাড়ি থেকে– মৃত্যু। করুণতম মৃত্যু!! এ ছাড়াও আরও বহু গাড়ি দুর্ঘটনার খবর প্রায় প্রতিদিনই হচ্ছে কিন্তু প্রতিকার নেই। কোন প্রতিকার নেই ! জাহাজডুবিতেও একই চিত্র!!

সম্প্রতি আমেরিকা ও কানাডা ভ্রমণকালে দেখেছি, যখন স্কুল ছুটির পর শিশু-কিশোররা রাস্তা পার হতে থাকে–,সব গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়, এমনকি কোথাও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা রাস্তা পার হতে ট্রাফিক পুলিশ তাদের ধরে রাস্তা পার করে দেয়। কোন বাস বা গাড়ি বেপরোয়াভাবে চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটালে আদালতের বিচারে তাদের হয় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। গাড়ির রোড-রুট বাতিলসহ দিতে হয় উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে।

আমাদের এই ঢাকা শহরে কোন কোন রাস্তায় সবুজ সঙ্কেত থাকা সত্ত্বেও গাড়ি আটকিয়ে রাখা হয়। এতে অফিসগামী এবং স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের হয় অহেতুক বিলম্ব। আমরা কোথায় যাব? কার কাছে জানাব নালিশ, চাইব প্রতিকার! সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী দেশ কলকাতা থেকে ঘুরে এলাম। দেখলাম লাল সঙ্কেত শেষ হতে এক/দুই মিনিটের বেশি সময় লাগে না। দুর্ঘটনা রাস্তাঘাটে খুবই কম। অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের মতো সেখানে গভীর রাতেও পথে বের হওয়া যায়, হয় না এমন ছিনতাইয়ের ঘটনা। আর আমাদের ঢাকা বা চট্টগ্রাম শহরে এটি হয়ত কল্পনাতীত, বিশেষ করে মেয়েদের জন্য।

এই সব ঘটনার প্রেক্ষিতে আমাদের বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবী এবং সাংবাদিকরাও সম্ভবত হাত গুটিয়ে থাকতে পারেন না। কারণ ম্যাটসিনির সেই বাণী– হু ডাইস্ ইফ দি কান্ট্রি লিভস? হু ডাইস ইফ দি কান্ট্রি ডাইস? দেশ মরলে বাঁচে কে? দেশ বাঁচলে মরে কে? অবশ্য নিরাপদ সড়ক চাই– এই মর্মে বিভিন্ন সময়ে প্রতিবাদ মিছিল হয়েছে।

কিভাবে উত্তরিত হওয়া যাবে এসব মর্মান্তিক ঘটনা থেকে? বন্ধ করা যাবে মর্মান্তিক মৃত্যু? আমরা এ বিষয়ে কিছু প্রস্তাব রাখতে চাই।

১. যে কোন গাড়ি-জলযান পথে নামাবার পূর্বে চালক এবং মালিক দেখবেন এর যন্ত্রপাতি এবং বিশেষ করে ব্রেক-সিসটেম ঠিক আছে কিনা। এটা ট্রাফিক পুলিশও দেখতে পারেন। কোন ত্রুটি দেখা মাত্র গাড়ি বা জাহাজের চলাচল তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেয়া যায়।

২. সব গাড়ি বিশেষ করে বাসের ড্রাইভার ঠিকমতো ট্রেইনড– পারদর্শী কিনা। তাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স দু' নম্বরী কিনা? তাদের প্রতিবছর লাইসেন্স নবায়নের সময় গাড়ি চালিয়ে দেখাতে হবে, আবার পরীক্ষা করতে হবে লাইসেন্সের আসল-নকল অবস্থা। ড্রাইভার নেশাজাতীয় দ্রব্যে অভ্যস্ত বা আসক্ত কিনা তাও দেখতে হবে।

৩. প্রতিটি রাস্তায়, বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বাজারের সামনে গাড়ির স্পীড লিমিট করে দিতে হবে। থাকবে স্ট্রীট ব্রেকার।

৪. গাড়ি বা জাহাজটি কত বছর থেকে চলছে, তার বর্তমান অবস্থা কি– উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করে তবেই রোড-পারমিট দিতে হবে।

৫. পুলিশের অযথা হয়রানি বা অহেতুক অবৈধ অর্থ আদায়ের জন্য (চট্টগ্রামের মতো) ঘটনা যাতে না ঘটে তা অবশ্যই (প্রয়োজনে সৎ গোয়েন্দাবাহিনীকে দিয়ে) নজরদারি করতে হবে এবং দোষী ব্যক্তির শাস্তিদানের ত্বরিত ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬. দুর্ঘটনার আরেকটি কারণ হলো অন্য একটি গাড়িকে দ্রুত অতিক্রম করার জন্য অস্বাভাবিকভাবে গতি বাড়ানোর প্রবণতা, যা ট্রাফিক পুলিশকে এবং অন্য গাড়ির চালকদেরও দেখে ঐ গাড়ির নম্বর পুলিশকে দিতে হবে জানমালের স্বার্থেই। কারণ এরূপ পরিস্থিতিতেই অধিকাংশ পথচারী দুর্ঘটনাকবলিত হয় থাকে। দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দ্রুত প্রস্থানের প্রবণতাও চিহ্নিত করতে হবে।

৭. প্রায়ই পত্রপত্রিকায় গাড়ি ডাকাতির খবর পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আমাদের উপদেশ হবে, অধিকাংশ গাড়িরই গেটলক ব্যবস্থা থাকলে ডাকাতরা উঠতে বা নামতে পারবে না, পথে যাত্রী তুলতে তাদের রীতিমতো সার্চ করে তবেই তুলতে হবে। করবে ডিটেক্টর দিয়ে সশস্ত্র নিয়োজিত আনসার।

৮. প্রতিটি গাড়িতেই মালিকের তত্ত্বাবধানে এবং বেতনভাতাসহ পূর্বোক্ত অস্ত্রধারী একজন আনসার রাখা যায় কিনা পুলিশ বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কেই এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। কারণ একজন মানুষের জীবন বাঁচাতে এ ব্যবস্থা প্রয়োজন এবং এটি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বও বটে। আলোচনার সময় পরিবহন সমিতিকেও ডাকতে হবে, বোঝাতে হবে। দুর্ঘটনা ঘটালে জনরোষে যে তাঁর লক্ষ টাকা দামের গাড়িটিও তো ভস্মীভূত হতে পারে তা কি তিনি বুঝবেন না?

উপরে যা বলা হলো তাতে গাড়ি দুর্ঘটনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ না হলেও হয়ত কিছুটা কমতে পারে, যে সম্বন্ধে একটি স্বাধীন দেশের বিবেকবান নাগরিকগণ হয়ত আরও কিছু প্রতিবিধানের উপদেশ রাখতে পারেন। কারণ আমরা অপঘাতে মরতে চাই না, হারাতে চাই না কোন নির্দোষ শুভ বিবাহযাত্রী বা ফুলের মতো–সুমীদের মতো সম্ভাবনাময়ী সন্তানদের। আমার-আপনার সন্তানদের। যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় গাইতেন–'একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি' ...।

৯. আমরা মনে করি, যে কোন দেশে যে কোন সমস্যারই আলাপ-আলোচনার মাধমে সমাধান দেয়া যায়। এই সমস্যার সমাধানও অসম্ভব নয়। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় অবিলম্বে ব্যস্থা নিক, দেশবাসী থাকবেন আপনাদের এই মহান উদ্যোগের সঙ্গে।

ইরাককে শুষে নেয়া হচ্ছে

এনামুল হক

ইরাকে মার্কিন সৈন্যরা ক্রুদ্ধ, হতাশাগ্রস্ত ও মোহাচ্ছন্নতামুক্ত। তারা এখন বুঝতে পারছে যে, ইরাকী জনগণকে মুক্ত করার জন্য তাদের সেখানে পাঠানো হয়নি। মারণাস্ত্রের সন্ধানেও পাঠানো হয়নি। তারা সেখানে কেন লড়ছে, কেন মরছে সেটাও তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তারা এটুকু জানে যে, ইরাকীরা তাদের ঘৃণা করে এবং সে ঘৃণা সামাহীন। মার্কিন সৈন্যদের এই অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ "উইল দে এভার ট্রাস্ট আস এগেইন?" গ্রন্থে। যুদ্ধাঞ্চল থেকে সাংবাদিক মাইকেল মুরের কাছে পাঠানো মার্কিন সৈন্যদের চিঠিপত্র অবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত। পত্র প্রেরকরা কেউ নিজের নাম উল্লেখ করেছেন, কেউ অজ্ঞাতনামা থেকেছেন, কেউবা নামের আদ্যক্ষরগুলো ব্যবহার করেছেন।

২০০৩ সালের ১২ জুলাই মাইকেল মুরের কাছে "আরএইচ" নামে এক মার্কিন সৈনিক লিখেছেন যে, ভয়ঙ্কর ধরনের হাজার হাজার লোককে হত্যার আশা নিয়ে তিনি ইরাকে গিয়েছিলেন। তাঁর ইউনিট ছিল বাগদাদে প্রবেশকারী প্রথম সেনা ইউনিটগুলোর অন্যতম। কিন্তু বাগদাদে প্রবেশের পর যেসব দৃশ্য দেখেন তাতে আতঙ্কিতবোধ না করে পারেননি। তাঁর চিন্তাভাবনার ক্ষমতা লোপ পেয়ে গিয়েছিল। এই প্রথম মানুষের লাশ তিনি সেখানে দেখতে পান। বিস্ফোরণে কারোর কারোর শরীরের অর্ধেকটা উড়ে গেছে। ছোট ছোট বাচ্চার কারোর পা নেই, হাত নেই। সেই দৃশ্য, সেই শব্দ, সেই আতঙ্ক সবকিছু আচ্ছন্ন করে ফেলে। জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত বাগদাদে ছিলেন আরএইচ। এই অবস্থানের প্রতিটি মিনিটকে ঘৃণা করেছেন তিনি। ঘৃণা করেছেন নিজের সেনাবাহিনীকে, নিজের কাজকে। নিজ মনোবল অটুট রাখার জন্য প্রতিদিন রীতিমতো সংগ্রাম করতে হয়েছিল তাঁকে।

ইরাককে শুষে নিচ্ছে কন্ট্রাক্টররা

ন্যাশনাল গার্ডের পদাতিক সেনা মাইকেল ডব্লিউ (৩০) বাগদাদের দক্ষিণ-পূর্বে নিয়োজিত। এ বছরের মার্চ মাস থেকে আছেন। মুরকে লেখা চিঠিতে ইরাকী প্রতিরোধ যোদ্ধাদের বিভিন্ন হামলার উল্লেখ করে বলেছেন যে, মার্কিন সৈন্যদের নিরাপত্তা বিধানে পর্যাপ্ত সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। বুশ তখন কোথায় ছিলেন? চিঠিতে মাইকেল বলেন, একটা ব্যাপার তাঁর কাছে বড়ই হাস্যাস্পদ লাগে। সেটা হলো, তিনি ও তাঁর বন্ধুরা ইরাকে যে কাজ করে মাসে প্রায় ৪ হাজার ডলার পাচ্ছেন সেই একই কাজ করে আমেরিকার ব্ল্যাকওয়াটার কোম্পানির একজন ঠিকাদার মাসে ১৫ হাজার ডলার আয় করছে। গোটা ইরাকে এখন অসামরিক ঠিকাদাররা ছড়িয়ে

আছে। ব্ল্যাকওয়াটার, কীলোগ ব্রাউন এ্যান্ড রুট, হ্যালিবার্টন– এমনি কত কি ঠিকাদার কোম্পানি! নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে লাঞ্চ সরবরাহ পর্যন্ত সমস্ত কাজই এই ঠিকাদাররা করছে। মার্কিন সরকার এই ঠিকাদারদের পিছনেই অর্থ ব্যং করছে। এখানে যত প্রকল্প নেয়া হয়েছে তার সামান্য ক'টিই পেয়েছে ইরাকীরা। মাইকেল লিখেছেন : "এ পর্যায়ে আমার জীবনটা ভাগ্যের ওপর ঝুলছে। এখন দেশে জীবিত অবস্থায় ফিরতে পারলেই হয়।"

ওদের ধারণা পাল্টে গেছে

স্পেশালিস্ট উইলি এ বছরের ৯ মার্চ মুরকে এক চিঠিতে লিখেছেন : "...এই যুদ্ধ নিয়ে এখানকার লোকদের (মার্কিন সৈন্যদের) সঙ্গে কথা বলতে যাওয়া খুব কঠিন। তারা শুনতে চায় না যে, যে কারণে তাদেরকে পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে এখানে আনা হয়েছে সেটা একেবারেই অবাস্তব। তাঁরা এটাও মানতে চায় না যে, প্রেসিডেন্ট তাদের কথাটা গ্রাহ্যই করেন না। কিছু কিছু লোক আমার ওপর বেশ চটা। সর্বক্ষণ যুক্তি দেয়ার চেষ্টা করা এবং কমান্ডার-ইন-চীফের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য এক পর্যায়ে আমি চাকরিচ্যুত হতে যাচ্ছিলাম।" সেই উইলি গত আগস্টের শেষদিকে মুরকে লিখেছেন : "এই যুদ্ধ সম্পর্কে মানুষের (সৈনিকদের) ধারণা একেবারে উল্টে গেছে। পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সৈন্যরা জন কেরীকে সমর্থন করার জন্য তাদের পরিবার-পরিজনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। অন্যান্য জায়গার অবস্থাও যদি এমন হয় তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অবস্থানরত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ভোট মনে হয় এবার বুশের পক্ষে যাবে না।"

ইরাক কোন হুমকি ছিল না

মাইকেল মুরকে লেখা কাইল ওয়াল্ডম্যানের চিঠির তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪। তিনি লিখেছেন : "আমরা সবাই বুঝতে পারছি, ইরাক যুক্তরাষ্ট্র তথা বিশ্বের প্রতি আশু হুমকি ছিল না এবং এখনও নেই। ইরাকে অবস্থানের মধ্য দিয়ে আমি ইরাকী জনগণ এবং যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ও দারিদ্র্যপীড়িত দেশটির অবস্থা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা লাভ করতে পেরেছি। আমি বুঝতে পেরেছি, এই যুদ্ধের সূচনা করেছে মুষ্টিমেয় লোক যারা যুদ্ধ থেকে মুনাফা লুটবে। সেই মুনাফা হবে একান্তই তাদের নিজেদের–তাদের জনগণের জন্য নয়। আমরা কোয়ালিশন বাহিনী ইরাকীদের মুক্ত করিনি–তাদের গভীরতর দারিদ্র্যে ঠেলে দিয়েছি মাত্র। ...আমাদের যেখানে শুধু ধ্বংস করার ট্রেনিং দেয়া হয়েছে, সেখানে আমরা এই দেশে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করছি। ...এসব নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে আমেরিকান জনগণ সচেতন নয় কেন? আমি ও আমার প্রেমিকা এখন রাজনৈতিক শরণার্থী হিসাবে কানাডায় চলে যাওয়ার কথা ভাবছি।"

কোটি কোটি ডলার লুটে নেয়া হচ্ছে

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মার্কিন ট্রাক ড্রাইভার এ বছরের ১৫ এপ্রিল তাঁর একটি চিঠিতে ছোট অথচ মারাত্মক একটি তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি জানিয়েছেন বেশ কয়েক মাস আগে ইরাকে কাজ শুরু করার পর থেকে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, তাঁর চেনাজানা মার্কিন শ্রমিক বা কর্মীদের সবাই তাদের টাইম শীটে শ্রমঘণ্টা অনেক স্ফীত করে দেখিয়ে থাকে। এভাবে এক অবিশ্বাস্য পরিমাণ লোভ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বৌদলতে মার্কিন করদাতা ও ইরাকী জনগণ উভয়ের কাছ থেকে কোটি কোটি ডলার লুটে নেয়া হচ্ছে।

আমি কেন বুশবিরোধী হলাম

প্রাক্তন সামরিক গোয়েন্দা অফিসার এন্ড্রু বালথাজার বাগদাদে ১০ মাস ছিলেন। এ বছরের ২৭ আগস্ট এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন যে, আমেরিকান সমাজের উপরিস্তরের মুষ্টিমেয় লোকের অর্থোপার্জনের লক্ষ্যে এই যুদ্ধের উৎপত্তি। এই যুদ্ধে অহেতুক সবাইকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়ার জন্যই তিনি ঘোরতর বুশবিরোধী হয়ে গেছেন– যদিও তাঁর পরিবার মূলত রিপাবলিকান সমর্থক। বালথাজার আরও লিখেছেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য দিতে পারেন যে বুশ প্রশাসন সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে লড়তে কিংবা সন্ত্রাসের মূল কারণগুলো দূর করতে ব্যর্থ হয়েছে।

বুশ মিথ্যাচারী

মার্কিন মেরিন কোরের এলসিপিএল শন হিউজ এ বছরের ২৮ মার্চ লিখেছেন ইরাক থেকে দেশে ফিরে কয়েক মাস কাটানোর পর তিনি এই দুর্ভাগ্যজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, বুশ একজন মিথ্যাচারী ও জঘন্য ব্যক্তি, যিনি সামরিক বাহিনীর সদস্যদের কথা একবিন্দুও ভাবেন না। ১১ সেপ্টেম্বর কমিশনের কাছে শপথ গ্রহণপূর্বক বক্তব্য দিতে বুশের অস্বীকৃতির ফলে যুক্তরাষ্ট্র দেশটি হাস্যাস্পদে পরিণত হয়েছে বলে শন হিউজ মনে করেন। তিনি লিখেছেন : "যেসব আদর্শের জন্য আমরা লড়ি ও জীবন দেই প্যাট্রিয়ট এ্যাক্টে সেগুলো লঙ ঘন করা হয়েছে। আমাদের মিথ্যা কথা বলে ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে আমি মনে করি, আমি প্রতারিত হয়েছি এবং আমার এই অনুভূতি প্রকাশ করার মতো ভাষা নেই।"

অমানবিক

যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্থ পদাতিক ডিভিশনের সৈন্য জোসেফ চেরউইনস্কি ৩ জুলাই ২০০৪ তারিখে তাঁর একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে লিখেছেন যে, একদিন তিনি ইরাকী শ্রমিকদের প্রহরায় নিয়োজিত ছিলেন। শ্রমিকরা বস্তায় বালু ভরছিল। তাপমাত্রা ছিল কমপক্ষে ১২০ ডিগ্রী ফারেনহাইট। চেরউইনস্কি পুরো ইউনিফর্ম পরে সেখানে বসে ছিলেন। মাঝে মাঝে পানি খাচ্ছিলেন। অসহনীয় তাপ। এ অবস্থায় তিনি ইরাকী শ্রমিকদের ছায়ায় এসে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিতে ও পানি খেতে বলেন। এভাবে তিনি তাদের ২০ মিনিট বিশ্রাম দেন। স্টাফ সার্জেন্ট এসে তাঁকে বলেন, ওদের বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের বস্তায় বালু ভরতে হবে। বলেই তিনি ইরাকীদের কাজে ফিরে যাবার নির্দেশ দেন। ৩০ মিনিট পর চেরউইনস্কি সার্জেন্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করে ইরাকীদের আবার বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ

দেন। কিছুক্ষণ পর সার্জেন্ট এসে আবার ওদের কাজে পাঠিয়ে দেন এবং বলেন, ওদের বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। ওরা এমন পরিবেশে কাজ করতে অভ্যস্ত। কিন্তু চেরউইনস্কি লিখেছেন যে, কয়েক ইরাকী সৈনিককে দেখেই তিনি বুঝেছিলেন, ওদের শরীর ভীষণ ডিহাইড্রেটেড হয়ে গেছে। বেশিরভাগের শরীর এত শীর্ণ ছিল যে, তাদের নিয়ে আন্তর্জাতিক খাদ্য সাহায্যের ওপর কোন কমার্শিয়াল ছবি বানানো যেতে পারে।

বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা আইন-২০০৪ প্রণয়ন প্রসঙ্গে

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শরীফ আজিজ পিএসসি (অব)

প্রাইভেট সিকিউরিটি কোম্পানি পরিচালনার জন্য নীতিমালা প্রণয়নে সরকারের উদ্যোগকে আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। এই ব্যবসাটি আমাদের দেশে নতুন বিধায় এর জন্য একটি নীতিমালা ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। সরকারের এই উদ্যোগে আমরা আশান্বিত। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের টুইন টাওয়ারের ঘটনা এবং পরবর্তিতে ইরাক ও আফগানিস্তানে যুদ্ধ সমগ্র পৃথিবীকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। যার প্রভাব আমাদের দেশেও পড়েছে। ক্রমবর্ধমান অবনতিশীল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়সমূহ ভীষণভাবে গুরুত্ব লাভ করেছে। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খোদ যুক্তরাষ্ট্রেও গঠন করা হয়েছে 'হোমল্যান্ড সিকিউরিটি' নামে একটি নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়। বিশ্বব্যাপী এইরূপ পরিস্থিতির আলোকে আমাদের দেশে প্রাইভেট সিকিউরিটি আইন প্রবর্তন, সিকিউরিটি কোম্পানিগুলোর কর্মপদ্ধতি সুসংহত করার জন্য সরকারী এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে।

বাংলাদেশের প্রাইভেট সিকিউরিটি কোম্পানিগুলোর ব্যবসায়িক লেনদেনের পরিমাণ কম হলেও গত কয়েক বছরে এর ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। প্রায় দেড় যুগ আগে সেনা, বিমান এবং পুলিশ বাহিনীর কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত উদ্যোগী অফিসার বাংলাদেশে প্রথম বেসরকারী সিকিউরিটি ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসাররা বেসরকারী সিকিউরিটি কোম্পানিগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এ সকল কোম্পানির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, পুলিশের আইজি ও অতিরিক্ত আইজির মতো জ্যেষ্ঠ পদবির অফিসারবৃন্দ। এঁদের মধ্যে অন্তত তিনজন আছেন যাঁরা রের্ণ্রধথধমল্র প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের অধিনায়ক ছিলেন। এ ছাড়াও রয়েছেন উচ্চ শিক্ষিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন বেসামরিক কর্মকর্তাসহ সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ বীর মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে রয়েছেন জনগণের ভোটে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরাও। এ সকল অফিসার দেশে ও বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাঁদের রয়েছে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশে ও দেশের বাইরে চাকরি করার অভিজ্ঞতা। এ সকল অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই তাঁরা দিয়ে আসছেন প্রথম সারির সিকিউরিটি কোম্পানিগুলোর নেতৃত্ব। বর্তমানে সেবা প্রদানকারী এই শিল্পে প্রায় ৫০ হাজারের মতো জনবল সম্পৃক্ত রয়েছে যার বেশিরভাগই অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, বিডিআর ও ব্যাটালিয়ন আনসারের সদস্য। নিরাপত্তা সেবা প্রদান ছাড়াও দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এই খাতটি যথেষ্ট অবদান রাখছে। সীমিত চাকরির বাজারে এত বৃহৎ সংখ্যক লোকের জীবিকার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রশংসনীয় একটি পদক্ষেপ।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ প্রফেশনাল সিকিউরিটি এ্যাসোসিয়েশনভুক্ত ৪৪টি কোম্পানির মধ্যে বড় কোম্পানিগুলো অত্যন্ত সুসংগঠিত ও কঠোর নিয়মতান্ত্রিক শৃঙ্খলায় আবদ্ধ ও দৃঢ় হস্তে পরিচালিত। এ সকল কোম্পানি নিজ উদ্যোগে ও নিজ পুঁজিতে পরিচালিত হয়ে আসছে। ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোনরূপ ঋণ না নিয়েই তারা সীমিত পরিসরে নিজেদের ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। সেই সঙ্গে তারা এত বিপুল সংখ্যক জনবলের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ করে দিয়েছে। কোন পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই বেসরকারী খাতে নিজ উদ্যোগে এত লোকের কর্মসংস্থান করার দৃষ্টান্ত খুব একটা বেশি নেই। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি বা জালিয়াতির সঙ্গে এদের কোন সম্পৃক্ততা নেই। কোথাও কোন ধরনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে থাকলে তদন্ত সাপেক্ষে দেখা যাবে যে সে সকল গার্ড কোন পেশাদার কোম্পানির সদস্য ছিল না। বড় সিকিউরিটি কোম্পানিগুলো উঁচু পেশাদারিত্বের মনোভাব নিয়ে পরিচালিত হয়ে আসছে। এ সকল গার্ড কোম্পানির সদস্যরা পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান। সম্মানিত যে সকল গ্রাহক এরূপ কোম্পানির কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করে আসছে তারাই এই ব্যাপারে আরও সুস্পষ্ট মতামত দিতে পারবে। বড় বড় সিকিউরিটি কোম্পানির প্রায় সবই প্রচলিত ব্যবসার নীতিমালা অনুযায়ী জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে নিবন্ধনকৃত। এদের রয়েছে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স এবং যাবতীয় হালনাগাদ ভ্যাট, আয়কর এবং অগ্রিম আয়কর প্রদানের অনুমতি/সনদপত্র। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বড় বড় সরকারী, বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় সিকিউরিটি সার্ভিসের টেন্ডার প্রদানের সময় এ সকল কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করা হয় এবং দারুণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই এ সকল কাজ সংগ্রহ করতে হয়।

বর্তমানে প্রায় সকল বেসরকারী ব্যাংক, বহুজাতিক কোম্পানি, তেল কোম্পানি, এনজিও, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসহ আমেরিকান দূতাবাস এমনকি জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থাসমূহ প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগ করেছে। আমেরিকান দূতাবাসের মতো একটি সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দূতাবাসের প্রাইভেট সিকিউরিটির সদস্য নিয়োগ থেকে সেবা প্রদানকারী এই শিল্পের গুরুত্ব সহজে অনুধাবন করা যায়। এ ছাড়াও বড় সিকিউরিটি কোম্পানিগুলোর রয়েছে ক্যাশ কেরিংয়ের (নগদ অর্থ বহন) ব্যাপক কার্যক্রম। প্রতিদিন এ সকল কোম্পানির

অসংখ্য গাড়ি বাংলাদেশের বড় শহরগুলোতে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোটি কোটি টাকা বহন করে আসছে এবং পৌঁছে দিচ্ছে যথাযথ স্থানে। ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা থেকে এ সকল ক্যাশ পৌঁছে দেয়া হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকে বা অন্যান্য ব্যাংক শাখায়। একইভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে পৌঁছানো হচ্ছে বিভিন্ন ব্যাংক শাখায়। গ্রাহকের কাছে নগদ টাকা হস্তান্তরের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও ব্যাংকগুলো প্রাইভেট সিকিউরিটি কোম্পানির ওপর নির্ভর করছে এবং তাদের সহায়তা নিচ্ছে। তাছাড়া সিকিউরিটি কোম্পানির সদস্যরা ব্যাংকে ভল্ট পাহারা দিচ্ছে, ব্যাংক শাখায় গানম্যানের দায়িত্ব পালন করছে। এমনকি সমুদ্রগামী জাহাজের এস্কর্ট হিসাবেও তারা দায়িত্ব পালন করছে। তা ছাড়াও করছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মৃত্যু দাবির তদন্তের মতো স্পর্শকাতর দায়িত্ব।

নানা প্রতিবন্ধকতা এবং অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও গার্ডদের দেয়া হচ্ছে পরিকল্পিত স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ। এ কথা সত্যি যে, সশস্ত্র বাহিনী বা পুলিশের মতো দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের সুযোগ গার্ডদের নেই তবে ন্যূনতম প্রশিক্ষণ তাদের দেয়া হয় যাতে করে সিকিউরিটির মতো স্পর্শকাতর দায়িত্ব মোটামুটিভাবে পালন করতে পারে তারা। সুপারভাইজার পদের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য এবং গ্রামবাংলা থেকে ১৮/২০ বছরের তরুণদের মধ্য থেকে গার্ড নির্বাচন করা হয়। গার্ডদের পুলিশের বিদ্যমান চ্যানেলে পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য অনুরোধ করা হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভেরিফিকেশনের রিপোর্ট পাওয়া যায়। চার সপ্তাহ প্রশিক্ষণ শেষে এদেরকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রদান করা হয়। এখানে আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করতে চাই। মিলিটারি একাডেমীতে প্রশিক্ষণকালে তিন মাস প্রশিক্ষণকাল পার হওয়ার পরও স্যালুটিং টেস্ট পাস না করায় শহরে সিনেমা হলে ছবি দেখার অনুমতি দেয়নি বা গেটের বাইরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে মাত্র এক মাসের প্রশিক্ষণ নিয়ে গ্রামবাংলার এই তরুণ দল গ্রহণযোগ্য মান অর্জন করে নিরাপত্তা সেবার মতো স্পর্শকাতর দায়িত্ব বেশিরভাগ জায়গায় ভালভাবে পালন করছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল বলে গার্ড সার্ভিসের জন্য প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জও খুব সামান্য এবং আশপাশের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে এই চার্জ অতি নগণ্য। যেমন থাইল্যান্ডে একজন গার্ডের জন্য গ্রাহক থেকে পাওয়া যায় ১২,০০০-১৫,৫০০ টাকা, শ্রীলঙ্কায় পাওয়া যায় ১২,০০০ টাকা অথচ বাংলাদেশের একজন গার্ডের জন্য সার্ভিস চার্জ পাওয়া যায় গড়ে ২,৫০০-৩,২০০ টাকা। এই সার্ভিস চার্জ থেকে তাদের সন্তোষজনক পারিশ্রমিক দেয়া কঠিন। এই উর্ধ দ্রব্যমূল্যের বাজারে একজন গার্ড কোনমতে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকে। তবুও স্বল্প বেতনভোগী এই গরিব গার্ডরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে। এত অল্প আয়ের পরেও কোম্পানিগুলোর তরফ থেকে গার্ডদের জন্য রয়েছে জীবন বীমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, সেভিংস এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা, স্বল্প খরচে বাসস্থান এবং প্রশিক্ষণের সময় খাবারের ব্যবস্থা। কোন কোন কোম্পানি নিজ উদ্যোগে গার্ডদের মেধাবী ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষা ভাতারও ব্যবস্থা করে আসছে। এ সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করে কোম্পানির লাভের পরিমাণ খুবই সামান্য। মাস শেষে গার্ডদের বেতন ভাতাদিপরিশোধ করতে আমাদের রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়, কেননা ১/৩ অংশ গ্রাহক নিয়মিত সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করেন না। এখানে উল্লেখযোগ্য, বর্তমানে প্রচলিত সকল ব্যবসায়ের মতোই প্রাইভেট সিকিউরিটি ব্যবসা পরিচালিত হয়ে আসছে। এ জন্য সরকার নির্ধারিত সকল ফীও পরিশোধ করা হচ্ছে। কিন্তু নতুন নীতিমালায় যদি সিকিউরিটি কোম্পানির লাইসেন্স গ্রহণের জন্য ২ লাখ টাকা ফী, ৩০,০০০/- টাকা প্রসেসিং ফী, ২০,০০০/- টাকা নবায়ন ফী প্রদান করতে হয় তা স্বল্প আয়ের সিকিউরিটি কোম্পানির ওপর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতোই হবে। প্রকৃতপক্ষে এত বিশাল পরিমাণ অর্থ দিয়ে লাইসেন্স গ্রহণের সামর্থ্য খুব কম সিকিউরিটি কোম্পানিরই রয়েছে। দেশে অন্যান্য প্রচলিত ব্যবসার ক্ষেত্রেও কি এই ধরনের বর্ধিত ফী ইত্যাদি প্রযোজ্য? তবে কেন আমাদের লক্ষ্যে এই ধরনের নিবর্তনমূলক ধারাসমূহের সংযোজনের উদ্যোগ?

সেবা খাতে গ্রাহকের সন্তুষ্টি লাভ করা খুবই কঠিন কাজ। এর প্রধান কারণ হলো গার্ড সার্ভিসে কম বেতনে লোকজন চাকরি করতে চায় না। কেবলমাত্র পুলিশ, বিডিআর, আর্মি, নেভি, এয়ার ফোর্স ইত্যাদিতে ব্যর্থ হওয়ার পরই এরা গার্ড সার্ভিসে ভাগ্যান্বেষণে আসে। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল প্রাইভেট সিকিউরিটি কোম্পানিগুলোর পক্ষে উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দিয়ে গার্ডকে পারদর্শী করে তোলা বাস্তবে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এরপরও আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য সেবা প্রদান করার। গার্ড ফোর্সের মতো জনবল পরিচলনা, নিয়ন্ত্রণ, ডিউটি রোস্টার তৈরি এবং সর্বোপরি তদারকি ও পরিদর্শন করা খুবই কঠিন এবং ক্লান্তিকর কাজ। ঢাকার জনাকীর্ণ রাস্তায় অসহনীয় যানজট, বোমা হামলার হুমকিসহ নানা সন্ত্রাসী হুমকির মধ্যে নগদ অর্থ বহন যে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এবং কিভাবে এটা সম্পন্ন করছি তা কেবলমাত্র সেনাবাহিনীর মিলিটারি অপারেশনে যে সকল অফিসার চাকরি করেছেন তাঁরাই এটা অনুধাবন করতে পারবেন। তবে প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে আমাদের ঝুঁকি এবং উৎকণ্ঠা অনেকগুণ বেশি। এই কঠিন ও দুরূহ কাজগুলো বেসরকারী সিকিউরিটি কোম্পানিগুলো নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে করে আসছে। সুদীর্ঘ ও কষ্টকর পেশা থেকে অবসর গ্রহণের পর আমরা যারা একটু অবকাশের জীবন কাটাব বলে ভেবেছিলাম তারা এমন একটি কঠিন কাজে নিয়োজিত হয়েছি যে সেটা স্বচক্ষে না দেখলে উপলব্ধি করা যাবে না। এ জন্য আমাদের কোন 'বাহবার' প্রয়োজন নেই। তবে ৫ অক্টোবর ২০০৪ ইং বিভিন্ন পত্রিকায় যেভাবে বেসরকারী সিকিউরিটি কোম্পানি সম্বন্ধে প্রতিবেদন লেখা হয়েছে তাতে আমাদের যথেষ্ট মনোকষ্ট হয়েছে। যেমন : "বর্তমানে দেশে বেসরকারী সিকিউরিটি সার্ভিসের জন্য কোন আইন নেই। যা ইচ্ছা তাই হচ্ছে। এ সার্ভিসের নামে বিভিন্ন অপরাধমূক কর্মকাণ্ড চলছে। বিভিন্ন সন্ত্রাসী চক্রও এ সার্ভিসে কৌশলে ঢুকে পড়ছে।"

সকল প্রতিষ্ঠানেরই কিছু না কিছু কমবেশি সমস্যা থাকে। ক্রমান্বয়ে এ সকল সমস্যা দূর করা হয়। বাংলাদেশের প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিসের সমস্যা এখনও তত প্রকট নয় বলে আমি মনে করি। তা ছাড়া গত ১৫ বছর যাবত দেশের সমস্ত নিয়মনীতি মেনেই এই ব্যবসা পরিচালিত হয়ে আসছে। তবে যদি কোন কোম্পানি অনুমতি ছাড়াই কর্মকাণ্ড চালিয়ে থাকে বা চালিয়ে যাচ্ছে এবং অনিয়ম করছে তাদের অবশ্যই আইনের আওতায় আনতে হবে।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবরে জানা যায় যে, আইন প্রণয়ন বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ইতোমধ্যে তিনটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা তৈরির জন্য একটি বিশেষ কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য বাংলাদেশ প্রফেশনাল সিকিউরিটি এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এবং অন্যান্য যারা সংশ্লিষ্ট তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। তবে কারও সঙ্গে এখনও আমাদের সাক্ষাত করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। আমরা মনে করি, এই সেবা প্রদানের সঙ্গে যারা প্রকৃত অর্থে জড়িত অর্থাৎ বাংলাদেশ প্রফেশনাল সিকিউরিটি এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নীতি নির্ধারকদের আলোচনার সুযোগ হওয়া উচিত। নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত থেকে আমরা এই মহতি উদ্যোগে অবদান রাখতে পারি। এই ব্যবসার সঙ্গে ১৭/১৮ বছরের অভিজ্ঞতা ও ইউনিফর্ম সার্ভিসের ২৫/৩০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সদস্যদের সম্পৃক্ততা বেসরকারী সিকিউরিটি কোম্পানি পরিচালনার জন্য একটি সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমরা মনে করি। যেহেতু সিকিউরিটি সার্ভিস এ দেশে নতুন তবে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে চালিত, তাই আমাদের অনুরোধ, প্রণীতব্য এই আইনটি যেন এই সেবাধর্মী ব্যবসার সহায়ক হয় এবং এই ব্যবসার প্রসার ঘটাতে সাহায্য করে। এতে যেন এমন কিছু শর্ত সংযোজিত না হয়, যার প্রভাবে এই বিকাশমান ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।